আতিউর রহমান

দুর্বল ‘উপেন’দের ভরসার কেন্দ্রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ

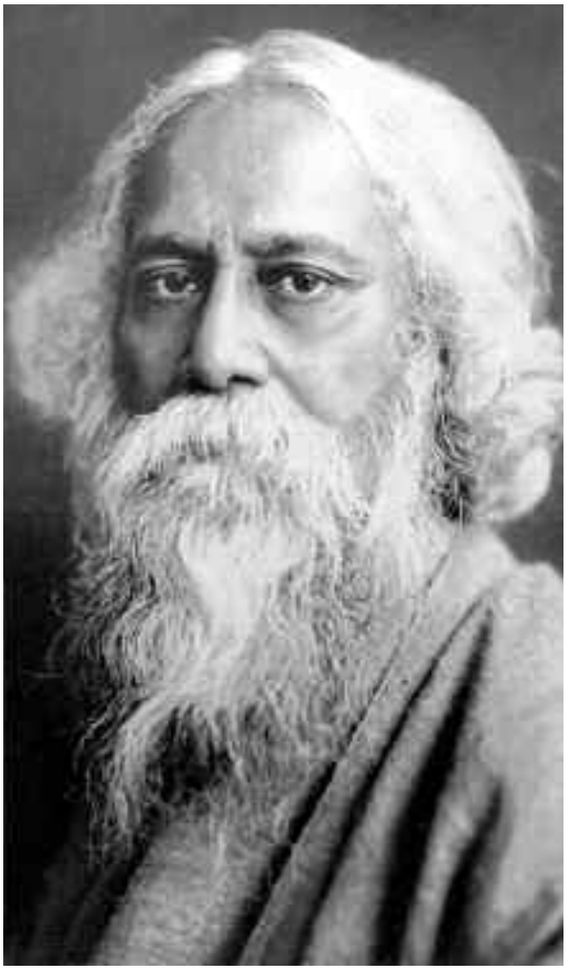

‘আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লী গ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েছে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশোনা- ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি, ওদের মতো নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছায়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্র রচনাবলি (রর), দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৯৬, পৃ. ৫৬২)। পূর্ব-বাংলাতেই তাঁর পরিচয় হয় ‘দুই বিঘা জমি’র উপেনদের সাথে। এখানেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, “এ জগতে, হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি, রাজার হস্ত করে সমস্ত-কাঙালের ধনচুরি।”

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ এসকল অসহায় কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। অধিকার নিয়ে, আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে তাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছেন। প্রচলিত জমিদারি প্রথার প্রতি বৈরাগ্য আর হতদরিদ্র চাষি প্রজাদের প্রতি মমতা কবি চরিত্রের এক অনন্য দিক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবতার কবি। জমিদার হয়েও তিনি গরিব কৃষকদের দুঃখ-বেদনা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। জমিদারি থেকে দু’পয়সা আয় করতেন তাতে তিনি ভীষণ বিব্রতবোধ করতেন। তিনি মনে করতেন জমিদারি প্রজাদের ট্রাস্টির মতো।

প্রজাদরদী রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন ছিলেন। বিশেষভাবে তিনি মানবিক অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। কবি চাইতেন জমিদাররা যেন দুঃখী মানুষের উপকার করে, তাদের অধিকার রক্ষা করে। তিনি বলেছেন, ‘....আমাদের দেশে জমিদার জমিদার মাত্র! তিনি জুলুম করিয়া খাজনা আদায় করিতে পারেন, কিন্তু সমাজে তাঁহার অধিক অধিকার নাই। ....বর্তমান জমিদারগণ যদি সেকালের দৃষ্টান্ত অনুসারে, কেবল রাজার মুখ না চাহিয়া, খেতাবের লক্ষ্য ছাড়িয়া জনহিত সাধন ও দেশের শিল্প সাহিত্যের রক্ষণ পালনে সহায়তা করেন তবেই তাঁহাদের ক্ষমতার সার্থকতা হয় এবং গৌরব বাড়িয়া উঠে। ....সেই মহৎ গৌরব এখানকার জমিদাররা প্রতিদিন হারাইতেছেন। দেশ যখন চাহিতেছে রুটি তাঁহারা দিতেছেন প্রস্তর; বঙ্গভূমি তাহার জলকষ্ট, তাহার অন্নকষ্ট, তাহার শিল্পনাশ, তাহার বিদ্যাদৈন্য, তাহার রোগতাপ লইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়াছে, আর তাঁহারা স্বদেশ প্রত্যাগত সাহেব-রাজকর্মচারীদের পাষাণ প্রতিমূর্তি গড়িয়া দিতেছেন।’ (রর, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৯৬, পৃ. ৮৬৯-৭৪)

রবীন্দ্রনাথ জমিদারদের মানবিক অধিকারে বিশ্বাসী হতে বলেছেন। তিনি নিরন্তর ভেবেছেন কী করে কৃষক তার আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে, কী করে অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, কী করে অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারে। সেজন্যে কবি সবসময় এইসব বঞ্চিত মানুষদের একত্র করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করতেন, মানুষ সংগঠিত হলে উন্নয়ন সহজ হয়। ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে ‘সমাজ’ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। সেজন্যেই তিনি শিলাইদহ, পতিসর ও শ্রীনিকেতনে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন সামগ্রিক কল্যাণ সাধন হলেই সব মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি ঘটবে। তিনি জমিদারগণকে প্রজাদের কল্যাণ সাধনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, আদর্শ সমাজ গঠনের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি ঘটবে, অধিকার সংরক্ষিত হবে। অধিকার অর্জনে কবি সকলকে উদ্যোগী হতে বলেছেন। কেননা, নিজেরা নিজেদের কর্মে উদ্যোগী হলেই নিজেদের অধিকার রক্ষা পাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘....আমরা যাচিত ও অযাচিত যে কোন অনুগ্রহ পাইয়াছি তাহা যেন ক্রমে আমাদের অঙ্গুলি হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে এবং তাহা যেন স্বচেষ্টায় নিজে অর্জন করিয়া লইবার অবকাশ পাই। আমরা প্রশ্রয় চাহিনা—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। ....আঘাত, অপমান ও অভাব, সম্পদের নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।’ *(ঐ, পৃ. ৭৩৯-৪৩)*

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, প্রতিকূলতার দ্বারাই শক্তির উদ্বোধন হবে। তিনি ‘শক্তি’ প্রবন্ধে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ চেয়েছেন। তাঁর মতে, সঙ্গবদ্ধভাবে শক্তি অর্জনই বিধেয়। মানুষ যদি দুর্বল হয়, বলহীন হয় তাহলে অধিকারের অধিকারী হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হওয়ার

কথা বলেছেন, সবার অধিকারকে মর্যাদা দিতে বলেছেন। সবার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিশ্বনাগরিক কবি রবীন্দ্রনাথ 'বিজয়া সম্মিলনী'র (২১ কার্তিক ১৩১২) ভাষণে বলেছেন, 'যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। ...মনে রাখিতে হইবে আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা রাজার কোন প্রসাদ বা অপ্রসাদের উপর নির্ভর করে না...আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন স্বদেশ...কোন মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিব না, কাহারো মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিব না, একবার যে হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি, সে হস্তকে ভিক্ষা পাত্র বহনে আর নিযুক্ত করিব না।' (ঐ, পৃ. ১৪২)

রবীন্দ্রনাথ দরিদ্র ও অসহায় কৃষকদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নে কৃষির বহুমুখীকরণের পাশাপাশি গ্রামীণ জনপদে অকৃষি খাতের যেমন-কুটির শিল্প, রেশমশিল্প ও তাঁতশিল্পের সম্প্রসারণসহ আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডের কথা বলেছেন। তিনি কুষ্টিয়ায় বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দিতে পতিসরে ও শ্রীনিকেতনে ব্যাংক স্থাপন করেন। এক পত্রে পতিসরের কৃষকদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রাম অধ্যক্ষগণকে উপদেশ দিয়েছেন, 'প্রজাদের বাস্তু বাড়ি ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস, কলা, খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সুতা বাহির হয়, ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল-আঙ্গুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তাহার মূল হইতে কি রূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে। ....কাছারিতে যে আমেরিকান ভুট্টার বীজ আছে তাহা পুনর্বার লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।' *(রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ১৩৪৩, পৃ. ১৮৮)*

রবীন্দ্রনাথ জানতেন রাজা বা জমিদার নানাভাবে প্রজাদের উৎপীড়ন করে। তাদের অধিকার খর্ব করে। সে কারণেই তিনি বারবার নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে কৃষক তথা প্রজাদের সংগ্রাম করতে বলেছেন—আত্মিকশক্তিতে শক্তিমান হতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, মানুষের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে অসীম ক্ষমতা। দুঃসময়ে মানুষ যখন চারদিকে অন্ধকার দেখতে পান, কোথাও আশার নৌকো জীবননদীর জলে ভাসে না, তখনও রবীন্দ্রনাথ অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে আঘাত করতে বলেছেন। এই আঘাতের ফলেই জেগে উঠবে সুপ্তোত্থিত চেতনা। তখন মানুষ নিজেই নিজের শক্তি দেখে অবাক হয়ে যাবে। তাই রবীন্দ্রনাথ বারবার মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনের কথা বলেছেন। পুঞ্জীভূত আত্মশক্তির সমাহারেই তৈরি হবে জীবন চলার আত্মপ্রত্যয়। *('আত্মশক্তি', রর, দ্বিতীয় খণ্ড)*

রবীন্দ্রনাথ অধিকার অর্জন করার জন্যে আত্মশক্তির উদ্বোধন করতে বলেছেন। কৃষকদের অধিকারবোধে আলোকিত করার কথা বলেছেন। 'চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে—জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসিতে জল আনা একই কথা। কিন্তু এ দুটো পন্থাই দুরূহ। প্রথমত চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পর মুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বৈ কমবে না।' (রাশিয়ার চিঠি, রর, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৯৬, পৃ. ৫৬২-৬৩)

মূলত তখনকার চাষিরা অজ্ঞ ছিল, নিরক্ষর ছিল, আধুনিক বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল না। তারা ছিল অতি সরল মনের। তাই জমি তাদের হলেও তা তাদের থাকবে না, মহাজনদের দ্বারা অপহৃত হবে। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই জমির অধিকার চাষিদের হাতে ছেড়ে দিতে বলেননি। ১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে লেখা 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে কবি প্রজাদের অধিকার চেতনা প্রকাশ করেছেন এভাবে—

'প্রতাপাদিত্য। তুমি এই সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়। খেপাই বই-কি! নিজে খেপি, ওদেরও খেপাই, এই তো আমার কাজ।

প্রতাপাদিত্য। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দু'বছরের খাজনা বাকি-দেবে কিনা বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপাদিত্য। দেবে না? এত বড়ো আস্পর্ধা!

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপাদিত্য। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে?

প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে, এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি। তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।' *(সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও মানবাধিকার, পৃ. ১২৩)*

রবীন্দ্রনাথ কখনো চাননি সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা অধিকার অর্জন। এমনকি তিনি সাম্যবাদী বল প্রয়োগের (যেমন সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া) দ্বারা সৃষ্ট নীতিকেও সমর্থন করেননি। তিনি দেখেছিলেন, আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে গণতন্ত্রের নামে শাসন করছে পুঁজিবাদী বা ধনতন্ত্রবাদীরা। সেখানে ধনী ব্যক্তির হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনে এতদঞ্চলের বিরাজমান ব্যবধান বা বৈষম্যকে কমিয়ে আনতে না পারলে কৃষক, শ্রমিক ও অসহায় মানুষদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব নয়।

মানবিক অধিকারবাদী রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন জমিদাররা গরিব চাষিকে শোষণ করে বড়লোক হয়। চাষিকে মানুষের মর্যাদা দেয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধীনস্ত এক কর্মচারীকে খাজনা ও কর আদায়ে দরিদ্র কৃষকদের প্রতি মানবিক হওয়ার পরামর্শ দিয়ে এক পত্রে লিখেছেন, 'প্রজাদের অবস্থা ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আদায় তহশীল করা শ্রেয়। ....সর্বতোভাবে প্রজাদের সহিত ধর্মসম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে হইবে। আমরা যে সর্বপ্রকারে প্রজাদের হিত ইচ্ছা করি তোমাদের ব্যবহারে তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। তোমার অধীনস্ত মণ্ডলের অন্তর্গত পল্লীগুলির যাহাতে সর্বপ্রকারে উন্নতিসাধন হয় প্রজাদিগকে সেজন্য সর্বদাই সচেষ্ট করিয়া দিবে। প্রজাদিগের প্রতি যেমন ন্যায় ধর্ম ও দায় রক্ষা করিবে তেমনি অধীনস্ত কর্মচারীদিগকে বিশেষভাবে কর্মের শাসনে সংযত করিয়া রাখিবে।....' *(আবুল আহসান চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ, শোভা প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ৭৭-৭৮)*

অপর এক পত্রে একজন দোষী প্রজার বিরুদ্ধে ম্যানেজার জানকীনাথ রায়ের শাস্তির প্রস্তাব বিষয়ে নমনীয় থাকার পরামর্শ দিয়ে কবি লিখেছেন, 'স্বার্থরক্ষার জন্য প্রবল ব্যক্তি স্বভাবত চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকে। সে স্থানে দুর্বল পক্ষের বেলায় চাতুরী দেখা গেলে আমরা যে রাগ করি সে চাতুরীর প্রতি রাগ নহে, দুর্বলের প্রতিই রাগ। কারণ এই দ্বারিক বিশ্বাসই চতুরতার দ্বারা আমাদের কোনো কাজ উদ্ধার করিলে প্রশংসা ও পুরস্কারের পাত্র হয়। এমন স্থলে নিজের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে চাতুরী প্রয়োগ দেখিলে আমাদের রাগ করিবার কারণ নাই। আমার প্রজারা নিজের বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার জন্য যখন চতুরতা করে আমার মনে তখন রাগ হয় না। তাহাদের বেদনা ও ব্যাকুলতা বুঝিবার আমি চেষ্টা করি। ....তোমরা যেটা কর্তব্যবোধ করিবে, তাহাই করিবে। কেবলমাত্র দণ্ড দিবার জন্য কিছুই করিবে না। দ্বারিক বিশ্বাস যদি প্রবল হইত তবে সে আমাকে দণ্ড দিবার চেষ্টা করিত। আমি দৈবক্রমে প্রবল হইয়াছি বলিয়াই যে ক্রোধ পরিতৃপ্তির জন্য তাহাকে দণ্ড দিব এবং সে তাহা অগত্যা বহন করিবে, এ আমি সংগত মনে করি না।' *(ঐ, পৃ. ৭৮)*

রবীন্দ্রনাথ যে আন্তরিকভাবেই চাইতেন চাষিরই জমির মালিক হওয়া উচিত-তার প্রমাণ মেলে তাঁর লেখা দুটি চিঠি থেকে। আমেরিকা থেকে প্রতিমা দেবীকে তিনি লেখেন, '....বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়—আমরা যেন ট্রাস্টির মতো থাকি।' আর একটি পত্রে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'যে রকম দিন আসচে তাতে জমিদারির উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে

মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েছে। যেসব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারির ব্যবসায় আমার লজ্জা বোধ হয়।' *(সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও মানবাধিকার, সুজন পাবলিকেশন্স, ১৯৮৬, পৃ.২২৭)*

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন কেবল এক শ্রেণির মানুষ অর্থনৈতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলে বা শহরকেন্দ্রিক উন্নয়ন হলে দেশের উন্নতি হয় না- প্রয়োজন দেশের সামগ্রিক উন্নতির। পল্লীবাসীরা অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকলে দেশের যথাযথ উন্নতি হয়েছে বলা যায় না। 'উপেক্ষিতা পল্লী' নামে এক দরদী ভাষণে কবি বলেছিলেন, 'বর্তমান সভ্যতায় দেখি এক জায়গায় একদল মানুষ উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে।' *(সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও মানবাধিকার, সুজন পাবলিকেশন্স, ১৯৮৬, পৃ. ২৪৮)*

সমাজের একাংশকে নিচে ফেলে রেখে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে যে আরোহণ করা যায় না সে কথাটি রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহুভাবে বলেছেন। 'গীতাঞ্জলি'তে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন যে যাকে আমরা নিচে ফেলি তারাই আমাদের বাঁধবে নিচে।

সমাজের একাংশকে নিচে ফেলে রেখে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে যে আরোহণ করা যায় না সে কথাটি রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহুভাবে বলেছেন। 'গীতাঞ্জলি'তে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন যে যাকে আমরা নিচে ফেলি তারাই আমাদের বাঁধবে নিচে। যাদের আমরা অপমান করছি তারাই আমাদের করবে অপমান।

> "যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে
> পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
> অজ্ঞানের অন্ধকারে
> আড়ালে ঢাকিছ যারে
> তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"
> *('গীতাঞ্জলি' ১০৮, রর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৩)*

প্রজাসাধারণের হিত সাধনই ছিল রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-জ্ঞান। সেজন্যে তিনি জমিদারির আমলাতন্ত্রের সংস্কার এনেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষদের একত্রিত করে সমবায় গঠন করে গ্রামোন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসবে। তাঁর এই 'সমবায়নীতি' বাস্তবায়নের জন্যে তিনি জমিদারি এলাকাকে কয়েকটি মণ্ডলে ভাগ করেন। এটা অনেকটা প্রাচীন পঞ্চায়েতী প্রথার আদলে ছিল। তবে সাংগঠনিক আকার ছিল ছোট। মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তনের পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের সমস্ত মানুষকে সংগঠিত করা, যেন গ্রামের উন্নয়ন কাজে কোন বাধা না থাকে। শিলাইদহে এই মণ্ডলী প্রথা প্রবর্তন ধনী কৃষক, জোতদার ও তাঁর নিজের জমিদারির আমলারা সুনজরে দেখেনি। বরঞ্চ নিজেদের ক্ষমতা কমে যাবে এই আশঙ্কায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। এমনকি মাত্রাতিরিক্ত বিরুদ্ধাচারণের কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ম্যানেজারকে বরখাস্তও করেছিলেন। বাংলা ১৩১৫ সালে শিলাইদহে মণ্ডলী প্রথা চালু হয়। পুরাতন ৮টি ডিহি-কাছারি ভেঙে শিলাইদহ সদরসহ পাঁচটি মণ্ডলী করা হয়। এর ফলে জমিদার এবং প্রজার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ হয়। সম্পর্কের উন্নতি হয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন জমিদারি প্রথা সংস্কার করে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

জমিদারির সংস্কার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছেন, 'এখন আমার কাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে। আমাদের জমিদারির মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগণাকে ৫টা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি; এই অধ্যক্ষরা সেখানে 'পল্লী সমাজ' স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোক নিজেদের হিত সাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে...পথঘাট পরিষ্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, সালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা গড়ে তোলে ইত্যাদি সর্বপ্রকারের গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়, তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে। আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু হিন্দুপল্লীতে বাধার অন্ত নেই।' *(রর, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ২২৬)*

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, জমিদাররা সামন্ত প্রথার ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে দরিদ্র প্রজাসাধারণকে শোষণের মাধ্যমে আয় বাড়ানোকেই নিজ কর্তব্য মনে করে। তারা খাজনা ও শুল্ক-কর আদায়, উচ্চ সুদের ঋণ ইত্যাদি সূত্র ধরে কৃষকদের উদ্বৃত্ত ফসল লোপাট করে। তাই কৃষকের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। তবে রবীন্দ্রনাথ কর বৃদ্ধি করলেও সেই সঙ্গে প্রজাদের কল্যাণে পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁর সেরেস্তার আমলাদের কর্তৃত্ব ও শোষণ কমাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেজন্যে জমিদার হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রজাদের কাছে অনন্য এক প্রজাহিতৈষী ব্যক্তিত্ব। পরিণত হয়েছিলেন প্রজাসাধারণের অভিভাবকে। যে কারণে অন্য জমিদারদের ক্ষেত্রে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিলেও রবীন্দ্রনাথের সময়ে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজাসাধারণের ন্যায়বিচার পাবার অধিকার নিয়েও ভেবেছেন। তিনি শিলাইদহ ও পতিসর— এই দুই পরগণায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি করে বিচার সভা স্থাপন করেন। প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ দেখা দিলে তা নিয়ে উভয় পক্ষই এই বিচার সভায় আসতো। কেবল ফৌজদারি ছাড়া অন্য কোন রকম মামলা নিয়ে কৃষকরা আদালতে যেত না। এমনকি বিচার সভায় বিচারে অসন্তুষ্ট হলে আপিলেরও বিধান করা হয়। প্রজাদের সম্মতিক্রমে সমস্ত পরগণার জন্যে পাঁচজন সভ্য নিয়ে একটি আপিল সভা নির্বাচন করা হয়েছিল।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ কোনো না কোনোভাবে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের অন্ন জুগিয়ে চলেছে গ্রাম-বাংলার অবহেলিত ও বঞ্চিত এই কৃষকেরা। কৃষকরাই এদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। তাঁরা জাতীয় বীর। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি। কৃষকের সন্তানেরাই দেশের জন্যে রক্ত দিয়েছে। আমার এক গবেষণায় দেখেছি, মুক্তিযোদ্ধাদের ৭৮ শতাংশই কৃষকের সন্তান। রৌদ্রতাপে আর বৃষ্টিতে ভিজে কৃষক খেতে যে সোনা ফলান, খাদ্যের জোগান দেন, তার ওপরই বেঁচে থাকেন সারা দেশের মানুষ। কৃষকের সন্তানেরাই প্রবাসে ঘাম ঝরিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে দেশের জন্য, গার্মেন্ট শিল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশের রপ্তানিখাতে উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, 'কৃষিবিদ্যায় জনসমাজকে দিলে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ সীমা থেকে বহুল পরিমাণে মুক্তি, সম্ভব করলে সমাজের বহু লোকের মধ্যে জীবিকার মিলন।' *(পল্লীপ্রকৃতি, রর, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৩৮২)*

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত রয়েছে। তাই অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে সবার আগে প্রয়োজন সবচাইতে বঞ্চিত অবহেলিত কৃষক সমাজের অধিকার নিশ্চিত করা। তাঁদের সম্মান দেয়া। কেননা কৃষকের ঘামঝরা উৎপাদন আমাদের জাতীয় উন্নতির ভিত্তি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রধান নিয়ামক। তাই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বাধীনতা আমাদের বড় বেশি প্রয়োজন। প্রয়োজন আগের সব অর্জনের সাথে সংযোগ স্থাপন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়।' *(রর, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৯৬, পৃ. ৬২৪)*

বর্তমান সময়ে দেশে যে কল্যাণধর্মী ও কৃষকবান্ধব উন্নয়ন নীতি কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে তা রবীন্দ্র চেতনারই প্রতিফলন। কৃষকের অধিকার নিশ্চিত করা, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাঁদের অধিকতর সম্পৃক্ত করা এখন সময়ের দাবি। দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। সেদিকে খেয়াল রেখেই বর্তমানে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে, যাতে সুবিধাবঞ্চিত দেশের এই সম্ভাবনাময় জনশক্তিকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা যায়। আধুনিক প্রযুক্তির যে আকাশছোঁয়া অগ্রগতি হয়েছে তার সুফল কী করে কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায় সেই ভাবনাও চলছে। কৃষকদের ভূমির অধিকার, ঋণপ্রাপ্তির অধিকার, উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য পাবার অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা ও সন্তানদের শিক্ষা পাবার অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে বর্গাচাষি ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণসেবাসহ আধুনিক ব্যাংকিংসেবা পৌঁছানোর উদ্যোগ নিয়েছে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কৃষকের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে যুগোপযোগী কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা। আমার বড়ই সৌভাগ্য যে বাংলাদেশ ব্যাংককে কৃষি ও কৃষকবান্ধব করার অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগগুলোর সূচনা-লগ্নে আমি এর সাথে ছিলাম।